রবীন্দ্রে বিজ্ঞান

অভিজিৎ রায়*

১

রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করে আমি যখন 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' নামের বিজ্ঞানভিত্তিক সিরিজটি ধারাবাহিকভাবে মুক্ত-মনার জন্য লেখা শুরু করলাম, তখন অনেকেই খুব অবাক হয়েছিলেন। কেউ কেউ এটিকে দেখেছিলেন 'সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন' হিসেবে। আমার এই সিরিজটি অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে বই আকারে বেরোয়, গত বছরের এপ্রিল মাসে। সেই বইয়ের মুখবন্ধে আমি প্রকাশ করেছিলাম কি করে হঠাৎ করেই রবিঠাকুরের গানের লাইনটি আমি শিরোনাম হিসেবে পেয়ে গেলাম:

> ...বইটির নাম 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' হল কেন এ নিয়ে কিছু বলা উচিৎ। সিরিজটি লেখার সময় আমি আসলে ভেবে পাচ্ছিলাম না এমন একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক সিরিজের নাম কি হতে পারে। কাব্যিক ধাঁচের নামের প্রতি আমার আকর্ষণ সব সময়ই প্রবল। চিন্তার বেড়াজালে আমি যখন কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, সে সময়েরই এক আলস দুপুরে ঘরে পায়চারী করতে করতে বুক শেলফে রাখা আমার প্রিয় কার্ল স্যাগানের বইটি অবচেতন মনেই হাতে তুলে নিলাম। মলাটে 'The Demon-Haunted World' শিরোনামের নীচেই সুন্দর একটা উক্তি - 'Science As a Candle in the Dark'। চমৎকার! এ ধরনের একটি নামই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। এমনি একটি সুন্দর পংক্তির যুৎসই বাংলা কোথায় খুঁজে পাব, যার মাধ্যমে ধ্বনিত হতে থাকবে আঁধার ঘুচিয়ে আলোকিত পথে যাত্রার ইঙ্গিত? স্যাগানের বইটি বুকের উপরে রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলাম মনের অজান্তেই - তন্দ্রার মধ্যে শুনলাম ক্যাসেটে বেজে চলেছে প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গিতটি :
>
> তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?
> ওই যে সুদূর নিহারীকা -
> যারা করে আছে ভিড়,
> আকাশের নীড়
> ওই যারা দিন-রাত্রি
> আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী,
> গ্রহ তারা রবি ...
>
> আর এখানে এসেই আমি থমকে গেলাম। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'- এই শব্দক'টি মনের গহীনে কোথায় যেন একটি অনুরণন তুলল। ভাবলাম এর চাইতে কাব্যিক আর মনোহর শিরোনাম আর কি হতে পারে? তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম আমার প্রথম বইটির শিরোনাম হবে আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'। যে গানটি কবিগুরু দুঃখভারাক্রান্ত মনে কাদম্বরী দেবীকে স্মরণ করে শত বছর আগে লিখেছিলেন, কখনও কি ঘূর্ণাক্ষরেও ভেবেছিলেন, এর একটি পংক্তি ব্যবহৃত হতে পারে বাংলাদেশের এক অখ্যাত লেখকের প্রথম বইয়ের শিরোনাম হিসেবে?...

বইটি প্রকাশ হবার পর বেশ কিছু ভাল পর্যালোচনা হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকায় [১]। এরপর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' নামে আমি আরেকটা সিরিজ শুরু করেছিলাম (সিরিজটি বর্তমানে ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত ত্রৈমাসিক নতুন দিগন্ত পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।)। এই শিরোনামটাও রবীন্দ্রনাথের আরেকটা গান থেকে চুরি করা! 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' মুলতঃ ছিলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। আর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' লেখা হয়েছিলো এই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির বস্তুবাদী ধারণাগুলোকে সমন্বিত করে। আমি চাইছিলাম এই সিরিজ দুটি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে, ঠিক যেমন আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' আর 'অনুমান'। সে সময় বহু পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন - 'আপনার অনেক প্রবন্ধই দেখছি শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন দিয়ে! কেন বলুন তো?' আবার কেউ আবার একটু খোঁচা মেরে বলতেন - 'আপনি তো দেখছি রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানীই বানিয়ে দিলেন'। আমি হেসে এড়িয়ে যেতাম। আমার মনে হয় এই পরিসরে এর ব্যাখ্যাটাও সেরে ফেলি। কাব্যিক ধাঁচের নামের প্রতি আমার আকর্ষণ আছে বলে কিংবা রবীন্দ্রসঙ্গিত আমার প্রিয় সেজন্যে শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের সাথে মানে তার সাহিত্যের সাথে যে বিজ্ঞানের একটা ছোট্ট হলেও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে তা বোধ হয় আমরা অনেকেই জানি না। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকেই শুরু করা যাক। মাত্র সাড়ে বারো বয়সে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাক্ষরিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন; শিরোনাম-'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। এটি কিন্তু এখন স্বীকৃত যে, 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা [২]। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ দু'জায়গায় সেই কিশোর বয়সে লেখা রচনাটির উল্লেখ করেছিলেন। এই অনেক বছর পরে শেষ বয়সে এসে কবিগুরু একশো পনের পৃষ্ঠার আরেকটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই লিখলেন, নাম - 'বিশ্বপরিচয়'। শুধু তাই নয়, তিনি বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার কৃতি শিক্ষক, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসুকে। রবীন্দ্রনাথ তার উৎসর্গপত্রে লিখলেন :

> 'বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'

আমি যেমনি ভাবে 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' আর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' - দুটি সিরিজ একে অপরের পরিপূরক হবে বলে ভাবছিলাম, রবীন্দ্রনাথও কি বিশ্বপরিচয় লিখবার আগে ঠিক তেমন করেই ভাবছিলেন? নয়ত তিনি বলবেন কেন -

> 'জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান - কেবলি এই দুই বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করছে' [৩]।

---

[১] মানুষ ও মহাবিশ্ব এবং আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, ডঃ শহিদুল ইসলাম, দৈনিক সংবাদ, জুন ১৬, ২০০৫ ;
পুস্তক পর্যালোচনা : আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, ডঃ হিরন্ময় সেনগুপ্ত, সাপ্তাহিক মৃদু ভাষণ, মে ৩০, ২০০৫;
Book Review : Avijit Roy's "Alo Hate choliyachey adharer Jatri" - an Effort to Highlight Scientific Truths Against Superstitious Beliefs, Dr. Shabbir Ahmed, Daily Independent May 28, 2005; Bangladesh Observer, June 06, 2005; Weekly Holiday, May 13, 2005 ইত্যাদি

[২] রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা, সুশান্ত কুমার মিত্র, অমৃত, ১৬ বর্ষ, ৮ ও ৯ সংখ্যা, ১৩৮৩ বাং
[৩] বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৫ খন্ড, পৃঃ ৩৫০

কিংবা আইনস্টাইনের মত একাকিত্বের যন্ত্রণা হয়ত রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন বিজ্ঞানের নান্দনিক সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে, তাই লিখেছেন :

> মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
> আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।

২

আইস্টাইনের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় ১৯২৬ সালে, কবিগুরুর দ্বিতীয়বার জার্মানী ভ্রমণের সময়। এই প্রথম সাক্ষাৎকারের অবশ্য কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটি নিশ্চিত যে, রবিঠাকুরের সান্নিধ্য আইনস্টাইনের মনে যথেস্ট শ্রদ্ধাবোধের জন্ম দিয়েছিলো। সেজন্যই আইনস্টাইন পরে চিঠি লিখে কবিগুরুকে জানিয়েছেন [৪] :

> ‘জার্মানীতে যদি এমন কিছু থাকে যা কিছু থাকে যা আমি আপনার জন্য করতে পারি, তবে যখন খুশি দয়া করে আমাকে আদেশ করবেন।’

আইনস্টাইনের মত জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছ থেকে প্রথম সাক্ষাতেই এমন চিঠি পাওয়া চাট্টিখানি ঘটনা নয়। তবে আইস্টাইনের সাথে কবির ‘সত্যিকারের’ যোগাযোগ হয় এর বছর চারেক পরে - ১৯৩০ সালে। সে সময় আইনস্টাইনের সাথে কবিগুরুর অন্ততঃ চারবার দেখা হয়। ১৪ ই জুলাই তারিখে আইনস্টাইনের সঙ্গে তার কথাবার্তার বিবরণ ‘রিলিজিয়ন অব ম্যান’ বইয়ের পরিশিষ্টে ছাপা হয়। জীবনের গভীরতম দর্শন, জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁরা সেদিন বিস্তারিত আলোচনা করেন। যারা উৎসাহী তারা মুক্ত-মনায় রাখা দিমিত্রি মারিয়ানফের সাক্ষাৎকারের বিবরণটি (১০ আগাস্ট ১৯৩০ সালের নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত) দেখে নিতে পারেন :
http://www.mukto-mona.com/Articles/einstein_tagore.htm

আইনস্টাইনের আস্থা ছিলো পর্যবেক্ষণ অনপেক্ষ ভৌত বাস্তবতায়। তিনি বিশ্বাস করতেন না মানুষের পর্যবেক্ষণের উপর কখনও ভৌতবাস্তবতার সত্যতা নির্ভরশীল হতে পারে। বোর প্রদত্ত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কোপেনহেগেনীয় ব্যাখ্যার সাথে তার বিরোধ ছিল মূলতঃ এখানেই। বোর বলতেন, ‘পদার্থবিজ্ঞানে কাজ প্রকৃতি কেমন তা আবিষ্কার করা নয়, প্রকতি সম্পর্কে আমরা কি বলতে পারি আর কিভাবে বলতে পারি, এটা বের করাই বিজ্ঞানের কাজ।’ এই ধরণাকে পাকাপোক্ত করতে গিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আরেক দিকপাল হাইজেনবার্গ দেখিয়েছিলেন যে, একটি কণার অবস্থান এবং বেগ যুগপৎ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। অবস্থান সুচারুভাবে মাপতে গেলে কনাটির বেগের তথ্য হারিয়ে যাবে, আবার বেগ খুব সঠিকভাবে মাপতে গেলে অবস্থান নির্ণয়ে গন্ডগোল দেখা দেবে। নীলস বোরের মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি কণাকে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কণাটি কোথায় রয়েছে

---

[৪] রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ২৩১

- এটা বলার কোন অর্থ হয় না। কারণ এটি বিরাজ করে সম্ভাবনার এক অস্পষ্ট বলয়ে। অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী ভৌতবাস্তবতা মানব-পর্যবেক্ষণ অনপেক্ষ নয় (১৯৮২ সালে অ্যালেইন অ্যাস্পেক্ট আইনস্টাইনের ই.পি.আর মানস পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করেন একটি ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে, যা কিন্তু বোরের যুক্তিকেই সমর্থন করে)। বলা বাহুল্য, আইনস্টাইন এ ধরনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের সাথে কথোপকথোনেও কিন্তু আইনস্টাইনের সেই একই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে [৫] :

আইনস্টাইন ঃ মহাবিশ্বের স্বরূপ নিয়ে দুটি ধারণা রয়েছে– জগৎ হল একটি একক সত্তা যা মনুষ্যত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল, এবং অন্যটি হল জগৎ একটি বাস্তবতা যা মনুষ্য উপাদানের ওপর নির্ভর করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঃ যখন আমাদের মহাবিশ্ব মানুষের সাথে ঐকতানে বিরাজ করে তখন শাশ্বত, যাকে আমরা সত্য বলে জানি, হয়ে দাঁড়ায় সৌন্দর্য, আমাদের অনুভুতিতে।

আইনস্টাইন ঃ এটি মহাবিশ্ব সম্পর্কে পরিশুদ্ধভাবেই মানবীয় ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ ঃ এ ছাড়া অন্য কোন ধারণা থাকতে পারে না। এই জগৎ বস্তুত মানবীয় জগৎ– এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও হল বিজ্ঞানী মানুষের দৃষ্টি। সুতরাং, আমাদের ছাড়া বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব নেই; এটি হল আপেক্ষিক জগৎ, যার বাস্তবতা আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল । যুক্তি ও আনন্দভোগের কতিপয় প্রামাণ্য রয়েছে যার মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটিত হয়; এই সত্যই হল শাশ্বত মানুষের প্রামাণ্য যার অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভুত হ"ছ আমাদের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই।

আইনস্টাইন ঃ এ তো হল মনুষ্য সত্তার উপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথ ঃ হ্যাঁ, এক শাশ্বত সত্তা। আমাদের এটি উপলব্ধি করতে হবে আমাদের আবেগ ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। আমরা মহামানবকে এভাবেই উপলব্ধি করি, আমাদের সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে, যে মহামানবের কোন স্বতন্ সীমাবদ্ধতা নেই; এটি হল সত্যের নৈর্ব্যাক্তিক মানবীয় জগৎ। ধর্ম এসব সত্যের উপলব্ধি করে, এবং আমাদের গভীরতম কামনার সাথে সংযোগ স্থাপন করে; সত্য সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তি চেতনা বিশ্বজনীন তাৎপর্য অর্জন করে থাকে। ধর্ম সত্যের ওপর মুল্যবোধ আরোপ করে থাকে, এবং আমরা জানি যে এর সাথে আমাদের স্ব ঐকতানের মিলনের মধ্য দিয়ে এই সত্য মঙ্গলময় বলে প্রতিভাত হয়।

আইনস্টাইন ঃ সত্য তাহলে, অথবা সৌন্দর্য মানুষের অস্তিত্ব অনপেক্ষ নয় ?

রবীন্দ্রনাথ ঃ না। আমি তা বলি না।

আইনস্টাইন ঃ মানুষের অস্তিত্ব যদি নাই থাকে, তাহলে বেলভেদরের অ্যাপোলোর সৌন্দর্যের অস্তিত্ব থাকবে না ?

রবীন্দ্রনাথ ঃ না।

আইনস্টাইন ঃ সৌন্দর্য সম্পর্কে আপনার এ ধারণার সাথে আমি এক মত, কিন্তু সত্য সম্পর্কে এ ধারণার সাথে একমত নই।

[৫] ভৌত বাস্তবতা : আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ, অজয় রায়; মুক্ত-মনা

রবীন্দ্রনাথ ঃ কেন নন ? সত্য তো মানুষের ভেতর দিয়েই প্রতিভাত হয়।

'সত্য তো মানুষের ভিতর দিয়েই প্রতিভাত হয়' -মনুষ্য প্রত্যক্ষণ-নির্ভর এই সত্যের কথা কবি আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তার একটি বিখ্যাত কবিতায়[৬] :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে–
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।

তুমি বলবে এ যে তত্ত্বকথা, এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব এ সত্য,
তাই এ কাব্য।

১৯৭৭ সালে নোবেল পুরস্কারে ভুষিত বেলজীয় রসায়নবিদ প্রিগোঝিন এ সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন:

> 'The question of meaning of reality was the central subject of a fascinating dialog between Einstein and Tagore. Einstein emphasized that the science had to be independent of the existence of any observer. This led him to deny the reality of time as irreversibility, as evolution. On the contrary Tagore maintained that even if absolute truth could exist, it would be inaccessible to the human mind. Curiously enough, the present evolution of science is running in the direction stated by great poet.'

অর্থাৎ, প্রিগোঝিনের মনে হয়েছে, *আধুনিক বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি যে দিকে ঘটছে তাতে আইনস্টাইনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথই সঠিক প্রমাণিত হচ্ছেন বেশী।* তবে সবাই যে প্রিগোঝিনের সাথে একমত হয়েছেন তা নয়। বিশেষ করে বার্ট্রান্ড রাসেল কবিগুরু সম্বন্ধে কখনই উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি একবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেন : 'আমি দুঃখিত যে রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার একমত হওয়া সম্ভব নয়। অনন্ত (infinite) সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা অস্পষ্ট প্রলাপমাত্র (vauge nonsense)। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সম্বন্ধে তার মন্তব্য ছিলো - 'It was unmitigated rubbish'। [৭]

---

[৬] আমি, *শ্যামলী*, (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)

[৭] Robindranath Tagore – The Myriad-Minded Man, K. Dutta and A. Robinson, p. 178.

৩

রবীন্দ্রনাথের সাথে বিজ্ঞানের নিবিড় সম্বন্ধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব। তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন [৮] :

> ‘বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া আসার দেনা পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্য বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশী ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্য আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানালা দিয়ে।’

অর্থের অভাবে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা যখন প্রায় বন্ধ হওয়ার যোগার হয়েছিল, তখন বন্ধুর গবেষণা যেন কোনভাবে বন্ধ না হয়, সে বিষয়ে মুল উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি ১৯০০ সালের ২০ এ নভেম্বর একটি চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন [৯] :

> ‘আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও, তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারিনে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও, সেটা যদি আমরা পুরিয়ে দিতে না পারি, তা হলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি কি সাহস করে এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধণ জরিয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি - সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করিনে। তুমি কি বল?’

কবিগুরু কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন, এ নিয়ে বোধ হয় জগদীশ চন্দ্রের মনে খানিকটা হলেও সন্দেহ ছিল। এ যে বিশাল টাকার ব্যাপার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসবানী যে স্রেফ কথার কথা ছিল না, এটি বোঝাতে পরবর্তী চিঠিতেই (১২ ই ডিসেম্বর, ১৯০০) আবারো লিখলেন রবীন্দ্রনাথ [১০] :

> ‘তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।’

তার বন্ধুকে সাহায্য করার আবেদন রবীন্দ্রনাথ অন্যদেরও জানিয়েছিলেন। এর প্রমাণ আমরা পাই রমেশচন্দ্র দত্তের ১৯০১ সালের ১৬ই জুলাই লন্ডন থেকে লেখা একটি চিঠিতে যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দু’লাখ টাকার একটি তহবিল গঠনের জন্য তাঁকে চেস্টা করতে বলেন। বলাবাহুল্য জমিদার রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও এত টাকা যোগার করা সে সময় সম্ভব ছিল না। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত শরণাপন্ন হন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্যের। শুধু জগদীশের গবেষনার জন্য টাকা জোগারের জন্যই ত্রিপুরা ভ্রমণ করেন। সেখান থেকেই অকটোবর কিংবা নভেম্বর মাসে (চিঠিটিতে কোন তারিখ ছিল না) তিনি জগদীশচন্দ্রকে লেখেন :

---

[৮] চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ষষ্ঠখন্ড (বিশ্বভারতী), পৃঃ ১২৪-২৫
[9] চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ষষ্ঠখন্ড (বিশ্বভারতী), পৃঃ ১৭
[১০] চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ষষ্ঠখন্ড (বিশ্বভারতী), পৃঃ ১৯

‘আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অথিতি হইয়া কয়েক দিন আছি। তিনি শীঘ্র বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সেটাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই এক বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্তমান সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।’

জগদীশের জন্য অর্থ সাহায্য করেই কেবল রবিঠাকুর ক্ষান্ত হননি, জগদীশের কাজ যাতে সাধারণেরা জানতে পারে, যাকে আমরা বলি ‘পপুলার লেভেল’-এ পৌঁছানো, তারও ব্যবস্থা করলেন তিনি নিজে। ১৯০১ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত (শ্রাবণ সংখ্যা) একটি লেখায় জগদীশ চন্দ্রের কাজের উপর ভিত্তি করে রবিঠাকুর রচনা করলেন একটি প্রবন্ধ - ‘*জড় কি সজীব?*’ [১১] । তার ও আগে আষাঢ় সংখ্যায় লিখেছিলেন *‘আচার্য জগদীশের জয়বার্তা’* নামের আরেকটি প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের হয়ত সংশয় ছিল প্রবন্ধগুলোর মান ও গুণ নিয়ে, তাই জগদীশচন্দ্র বসুকে একটি চিঠিতে বলেছিলেন - ‘ আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্ট্রিশ্যান প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্য তোমার নব আবিস্কার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে দিয়াছিলাম- পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক থাকিবার সম্ভাবনা আছে - দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।’

না, জগদীশ চন্দ্র বসু হাসেন নি। বরং উলটো বলেছিলেন [১২] :

‘তুমি যে গত মাসে আমার কার্যের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া লিখিতে পার, ইহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।’

১৯১৭ সালের ৩০ এ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে দিয়ে সমস্ত দেশের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জগদীশচন্দ্রকে বলেছেন, ‘এ তো তোমার একার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হতে চলল।’ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময় কবিগুরু ছিলেন আমেরিকায়। তারপরেও শত ব্যস্ততার মাঝে উদ্বোধনী সঙ্গীত লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেই বিখ্যাত সঙ্গীতটিই হল- ‘মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে’।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। পুরস্কার ঘোষিত হয় ১৯১৩ সালের ১৩ ই নভেম্বর। রবীন্দ্রনাথ খবর পান ১৬ ই নভেম্বর। এর ঠিক তিনদিন পরে জগদীশ চন্দ্র তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এভাবে [১৩] :

‘ বন্ধু ,
পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। ...’

---

[১১] রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ১২৫

[১২] পত্রাবলী, জগদীশ চন্দ্র বসু, পৃঃ ১০২

[১৩] পত্রাবলী, জগদীশ চন্দ্র বসু, পৃঃ ১৯২

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এভাবে কথা বলার অধিকার যদি কেউ রেখে থাকেন, তবে নিঃ সন্দেহে তা জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনি কিন্তু বলেন নি যে কবির পুরস্কার পাবার ঘটনায় তিনি 'আনন্দিত'। তিনি বলেছেন - তাঁর 'দুঃখ দূর হল'। এ যেন যথার্থ বন্ধুর চাপা আনন্দের এক নির্মোহ স্বর!

২৫.৪.২০০৬

** অভিজিৎ রায় পেশায় প্রকৌশলবিদ এবং মুক্ত-মনা (www.mukto-mona.com) ওয়েব সাইটের প্রতিষ্ঠাতা। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' গ্রন্থের লেখক। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com*

{ লেখাটি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় এবং দৈনিক ভোরের কাগজে ৫ ই মে, ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত }